খালু ও মুক্তিযোদ্ধারা

শুজা রশীদ

খুলনায় পৌঁছে খালাকে জড়িয়ে ধরে মা অনেক কান্নাকাটি করলেন। আমরা যে ঘরটিতে আগে ছিলাম সেটা তখনও সেভাবেই ছিলো। আমরা আবার ঐ ঘরেই বাস করতে শুরু করলাম। রনি ভাইয়ের এখন পর্যন্ত কোন খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু সবাই ধারণা করছে সে এখনও ভারতেই আছে। ট্রেনিং শেষ হলে কোন দলের সাথে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বে। মনি ভাইকে দেখে খুবই অবাক হলাম। মাত্র কয়েকদিনেই তার মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখলাম। বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে ছাদে আড্ডা দেয়া সে প্রায় বন্ধই করে দিয়েছে। অধিকাংশ সময়েই ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। আমি তার চিলেকোঠার ঘরে যেতে আমাকে বসতে বললো। - তোরা চলে এসেছিস ভালো হয়েছে।

আমি মাথা নাড়ি। - হ্যাঁ ডাকাতি পড়ায় মা খুব ভয় পেয়ে গেলো।

মনি ভাই নিঃশব্দে কিছুক্ষণ ধুমপান করে। –তোর কি মনে হয় বাংলাদেশ ভালো না পাকিস্তান ভালো?

আমি বিশেষ চিন্তা করি না। - বাংলাদেশ ভালো। এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।

মনি ভাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। - তুই ছেলেমানুষ, বুঝিস না। বাংলাদেশ হলে হিন্দুদের জ্বালায় টিকতে পারবি না। এখন বাসায় কাজ করে, তখন ঘাড়ের উপর পা দিয়ে দাঁড়াবে। দেখিস না ভারতে মুসলমানদের কি দশা।

মনি ভাই অস্থিরভাবে পায়চারি করে কিছুক্ষণ। - রনিটা যুদ্ধে গেলো। মাথার মধ্যে ভালো লাগে না। ধর্ম বড় না দেশ বড়? পাকিস্তান না ভারত .....

- বাংলাদেশ বলো।

- বাংলাদেশ না ছাই। ভারত। বাংলাদেশ হলে আমরা হবো ভারতের পা চাটা। এখন পাকিরা লুটছে তখন ভারত লুটবে।

- তুমি যুদ্ধে যেতে চাও মনি ভাই? আমি বড় হলে ঠিক যেতাম। ওরা কত মানুষ মারলো ক'দিন আগে। আমি ওদেরকে গুলি করে মারতাম।

- তুই ছোট হয়ে বেঁচে গেছিস। বড় বাঁচা বেঁচে গেছিস। যুদ্ধে কেন যাবো? মনের ভেতরে সাড়া পাই না কেন? যাক ওসব। চল বাইরে গিয়ে সিঙ্গাড়া খেয়ে আসি।

উত্তম প্রস্তাব। আমরা কুমারের দোকানে গিয়ে ভাঙাচোরা একটা বেঞ্চি দখল করি। কুমার দারুন সিঙ্গাড়া বানায়। মনি ভাইয়ের কাছে সে পয়সা নেয় না। ধীরে ধীরে মনি ভাইয়ের আরো কয়েকজন বন্ধু আসে। অন্য সময় তাদের হৈ-চৈয়ে দাঁড়ানো যায় না। আজ সকলেই বেশ চুপচাপ, অন্যমনস্ক। আমি একসময় বাসায় চলে এলাম। মায়ের শরীরটা আবার খারাপ। আমি কাছে থাকলে একটু জোর পান বলে মনে হয়।

সন্ধ্যায় বাসাটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মা ঘরে শুয়ে আছেন। খালা তার পাশে। দু'জনে নীচু গলায় গল্প করছেন। রুশী উপরতলার ভাড়াটের ছোট মেয়েটার সাথে পুতুল খেলতে গেছে। রান্নাঘরে পার্বতীর মা, সাধারণত খালাই রাঁধেন, সেও মাঝে মাঝে সাহায্য করে। আমি মায়ের ঘরে একবার উঁকি দিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াই। টিয়া পাখির শূন্য খাঁচাটা এখনও ঝুলছে। মনটা আরো খারাপ হয়। ইউনুস চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না। খালার ধারণা সেও রনি ভাইয়ের কাছে গেছে ট্রেনিং নিতে। খালুর ধারনা তার যুদ্ধে যাবার মতো বুকের পাটা নেই। হয়তো অন্য কোথাও ভালো কাজ পেয়ে ফুটেছে। সে যাওয়ায় কারো তেমন অসুবিধা হয়েছে বলে মনে হয় না। কাজে কর্মে ইদানীং তার মন ছিলো না। মনি ভাইয়ের সাথে সারাক্ষণ খিটমিট লেগে থাকতো। মনি ভাই নাকি তাকে একটা চড়ও দিয়েছিলো একদিন। তারপরই সম্ভবত সে চলে যায়। খালার মুখ থেকেই শুনেছিলাম।

চেম্বার থেকে খালুর উত্তেজিত কণ্ঠ ভেসে আসছে। দরজা ভেড়ানো সুতরাং ভেতরে কে কে আছে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু তার পার্টির অনেকের মতই তিনি পাকিস্তানী সরকারের সমর্থক। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের সাথে জোট পাকিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের কোন আগ্রহ তার নেই। তবে তিনি হত্যায় বিশ্বাসী নন। হিন্দু ভারতের প্রতি তার ঘৃণাবোধ থাকলেও হিন্দুদের প্রতি তার কখনো কোনরকম ঘৃণা ছিলো এমন কথা কেউ বলতে পারবে না। বরং তার বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ তাকে এলাকার হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছেই জনপ্রিয় করে তুলেছে। তিনি এলাকাবাসীদের মধ্যে সম্প্রীতি ও শান্তি বজায় রাখার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে একটি শান্তি কমিটি গঠন করেছেন। কিন্তু তারপরও একটি ব্যাপার অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছি রনি ভাইয়ের কথা বলবার সময় খালুর কণ্ঠে যেন বিশেষ রকমের গর্ব ফুটে ওঠে। এই যুদ্ধ তিনি সমর্থন না করতে পারেন, তার নিজের একটি ছেলের যে যুদ্ধে যাবার মতো বুকের পাটা আছে, নিজের নীতিবোধে অনড় থেকে জীবন বাজি রাখবার মতো মানসিক জোর আছে - এই ব্যাপারটা যে তাকে যথেষ্ট গর্বিত করেছে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তার এই আচরণ বোধহয় মনি ভাইকে আরো আহত করে কারণ ইদানিং সে রাতে খাবার সময়েও আর সবার সাথে বসে না, পরে খায়।

ঐ দিন মাঝরাতেই হঠাৎ মায়ের ব্যথা উঠলো। আমি ও রুশী ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মায়ের চিৎকারে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসলাম। খালা ছুটে এলেন।

-কি হলোরে, জায়রা?

মা বললেন - আমার সময় হয়েছে, বুবু। জলদি ধাইমাকে ডাকো। এই পাড়ায় ধাই বলতে আছে তুর্যের মা। সে পার্বতীর প্রতিবেশি। খালা পেছনের বারান্দায় গিয়ে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন - ও তুর্যের মা, তুর্যের মা। জায়রার সময় হইছে। তুর্যের মা ও পার্বতীর মা দু'জনই তাদের ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। দশ মিনিটের মধ্যেই আরো কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে তারা এসে হাজির হলো খালার বাসায়। ইতিমধ্যে মায়ের ঘর থেকে আমাকে ও রুশীকে বিতাড়িত হতে হয়েছে। রুশীকে নিয়ে গেলো দোতালার ভাড়াটে মহিলা, তার মেয়ের সাথে শোবে সে। মনি ভাই চেঁচামেচি শুনে তার চিলেকোঠা থেকে নীচে নেমে এসেছে। আমি তার সাথেই থাকলাম। হঠাৎ কোন দরকার পড়লে খোঁজাখুঁজি করতে না হয়। তুর্যের মা ও খালা

শুধু ঢুকলেন মায়ের ঘরে। বাকি মহিলারা বাইরের বারান্দায় বসে বেশ গল্প জুড়ে দিলো। খালু একটু পর পর অস্থির কণ্ঠে বলতে লাগলেন - হাসপাতালে নিয়ে গেলে হতো না? এতো বড় একটা ব্যাপার।

খালা তাকে একটা ধমক দিলেন। - তোমার ছেলেরা সব তুর্যের মায়ের হাতে হয়েছে। এখন হঠাৎ হাসপাতাল-হাসপাতাল করছো কেন? জায়রা ঠিক আছে। বাচ্চা জায়গামতো আছে। কোন অসুবিধা হবে না। তুমি বিছানায় বসে বিশ্রাম নাও।
- হ্যাঁ, এমন অবস্থায় বিশ্রাম নেয়া যায়!
খালু পায়চারি করতে লাগলেন। আমি আর মনিভাই মায়ের ঘরের সামনে ছোট বারান্দার মেঝেতে বসে পড়লাম। কখন মনি ভাইয়ের কাঁধে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে গেছি খেয়ালও নেই। হঠাৎ একটা সদ্যজাত শিশুর আধো আধো কান্নায় ঘুম ভাঙলো। মনি ভাইও মনে হয় ঘুমিয়ে গিয়েছিলো। কারণ সেও দুই চোখ মুছতে মুছতে বললো - তোর ভাই হয়েছেরে একটা। যা দেখে আয়।
আমি তড়াক করে লাফিয়ে মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। মায়ের পাশে এই একটুখানি একটা বাচ্চাকে দেখে খুবই অবাক হলাম। আমাকে দেখে মনে হলো তার কান্নার তেজ বাড়লো। মা ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন- ঠিক তোর মতই দেখতে হয়েছে রে। শুধু চুলগুলো কোঁকড়া।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম- আমি ওকে অনেক ভালোবাসবো। কখনো ব্যথা দেবো না। তুমি দেখো।
বাকি রাতটুকু ঝট করেই পেরিয়ে গেলো। সকাল হতেই প্রতিবেশী মহিলারা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে দল বেঁধে নতুন বাচ্চা দেখতে এলেন। বাড়িতে যেন রীতিমতো উৎসব লেগে গেলো। খালু প্রচুর মিষ্টি কিনে আনলেন। বাড়ি বাড়িও মিষ্টি বিলানো হলো। আমি মিষ্টি খেয়ে পেট ভরিয়ে ফেললাম।
সপ্তাহখানেক পরে বহু ভাবনা চিন্তার পর শিশুটির নাম রাখা হলো মিল্কী। নামটা কে প্রথম প্রস্ত াব দিয়েছিলো খেয়াল নেই কিন্তু শিশুটির খাওয়ার বহর দেখেই এমন নাম। খুব শীঘ্রই মিল্কীর সাথে আমার বেশ খাতির হয়ে গেলো। আমাকে দেখলে সে যেন ঠোট বাঁকিয়ে হাসে। তবে আফসোসের ব্যাপার এই যে, আমার চেয়ে রুশীর সাথে কোন এক অদ্ভুত কারণে তার খাতির বেশী। রুশীকে দেখলেই সে খুব হাত পা নাড়ায়। এই ছিচকাঁদুনেকে দেখে এমন আনন্দিত হবার কারণটা আমার মাথায় ঢোকে না।

মিল্কীর জন্মের পর সম্ভবত দুই সপ্তাহ পেরিয়েছে। আমরা সবাই রাতে খেয়ে দেয়ে ঘুমাতে চলে গেছি। আমি আর রুশী আবার মায়ের সাথে শুতে শুরু করেছি। মিল্কী থাকে মায়ের এক পাশে, আমরা অন্য পাশে। রাত তখন কটা বাজে জানি না, কিন্তু ভয়ানক চেঁচামেচির শব্দে আমাদের সবারই ঘুম ভাঙলো। বেশ কিছুক্ষণ শুধু হৈ চৈ শুনলাম। একটা শব্দের অর্থও বুঝলাম না। ঘুমটা ভালো মতো ভাঙতে ধীরে ধীরে মাথাটা পরিষ্কার হলো। এবার বাইরের চিৎকার চেঁচামেচির কারণটা বুঝতে পারলাম। বেশ কয়েকজন যুবক খালুর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকছে। খালুর বাসার সামনে লোহার গেট। গেট পেরিয়ে এলে ছোট আঙিনা। তারপরে

লম্বা বারান্দা। সেই বারান্দার শরীর ঘেঁষে পাশাপাশি আমাদের কামরা ও খালাদের কামরা। যুবকদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে আঙিনা থেকে। যার অর্থ তারা গেট পেরিয়ে এসেছে। কয়েকটা জানালার কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ পাওয়া গেলো। –এই মোসাব্বেরের বাচ্চা, বাইর হ? শালা, পাকিস্তানীদের চামচা। আজ তোকে শেষ করবো আমরা। বাইর হ! শালা খুনী।

মা আমাদের দুই ভাইবোনকে জড়িয়ে ধরে ঠক ঠক করে কাঁপছেন। মিল্কীও ঘুম থেকে উঠে তারস্বরে চিৎকার করে কাঁদছে। হঠাৎ খালুদের ঘরের দরজা খোলার শব্দ পেলাম। খালুর গলা শুনলাম। - কাকে খুনী বলিস তোরা? আমাকে? কবে কাকে খুন করেছি আমি? বল কাকে খুন করেছি? আমি সাচ্চা মুসলমান। হিন্দুদের চামচামি করতে পারবো না। এটা আমার দোষ? এই জন্যে তোরা আমাকে মারতে চাস?

তার কণ্ঠস্বর চাপিয়ে খালার কাঁপা কাঁপা গলা ভেসে এলো –উকিল সাহেবকে তো তোমরা চেনো, বাবারা। মানুষের কোন ক্ষতি সে কখনো করে নাই। তোমরা মুক্তিযোদ্ধা। তোমরা কেন ভালো মানুষ মারবা? আমার এক ছেলে গেছে যুদ্ধে। রনিকে তোমরা চেনো না? রনি তো যুদ্ধে গেছে।

খালাকে থামিয়ে জনৈক যুবক গর্জে উঠলো - আপনার স্বামী পাকিস্তানীদের স্পাই। আমরা চাই স্বাধীন বাংলাদেশ। আমরা ঐ খুনীদের এই দেশ থেকে লাথি মেরে বের করতে চাই। আপনার স্বামী এদের সাথে হাত মিলিয়েছে। আপনি জানেন ঐ পাকিস্তানীর বাচ্চারা কত বাঙ্গালী মেরেছে? খুনের বদলে খুন চাই। এই যা, খুন কর এই স্পাইটাকে।

খালা আর্তকণ্ঠে কেঁপে উঠলেন। খালুর কণ্ঠ শুনতে পেলাম। –মারবি মার। আমি মৃত্যুর ভয় পাই না। আল্লাহর পথে থেকেছি। মার গুলি .....।

হঠাৎ যেন মায়ের শরীরে এক অসম্ভব শক্তি ভর করলো। আমাদেরকে ছেড়ে দিয়ে তড়াক করে খাট থেকে লাফিয়ে নামলেন তিনি, দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। আমিও তার পিছু নিলাম। রুশী খাটের নীচে ঢুকে মিল্কীর সাথে পাল্লা দিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

বারান্দায় বেরিয়ে দেখলাম দু'টি যুবক বন্দুক হাতে বাস্তবিকই খালুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাকি কয়েকজন যুবক উঠানে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মা সবাইকে অবাক করে দিয়ে অগ্রসরমান যুবক দুজনের পথের উপরে দুইহাত লম্বা করে দাঁড়িয়ে গেলেন।

–এমন কাজ করো না বাবা তোমরা। এই লোকটা আমার দুলাভাই বলে বলছি না, কিন্তু তিনি কোনদিন কারো কোন ক্ষতি করেন নাই। এই পাড়ার সমস্ত হিন্দুরা বিপদে পড়লে এখানে ছুটে আসে। তারা তাদের জীবন দিয়ে তাকে বিশ্বাস করে। তোমরা তাকে ভুল বুঝো না।

–সরে যান আপা, সরে যান। খুনের বদলে খুন না নিলে ঐ বর্বর পাকিস্তানীদের দল থামবে না। সারাদেশে ওরা রক্তের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। আর এই চামচাগুলো ওদের সাথে জোট পাকিয়ে আমাদের সর্বনাশ করছে। ওদের সবক'টাকে একটা একটা করে গুলি করে মারবো।

খালু চিৎকার করছেন- মার। তোদের ভয় পাই না আমি। শুধু আল্লাহর ভয় পাই। কর গুলি।

মা মুক্তিযোদ্ধা ছেলেগুলির হাত ধরে কাকুতি মিনতি করতে লাগলেন। –তোমরা সবাই খুলনার ছেলে। এই মানুষটাকে তো তোমরা অল্প বেশি চেনো। কবে শুনেছো সে কারো ক্ষতি করেছে।

দোহাই তোমাদের বাবারা, এই কাজটা করো না। আমার ছোট বাচ্চাটার দিব্যি দেই বাবা তোমাদের। এই কাজ করো না।

ছেলেগুলি মায়ের মিনতিতে নরম হয়ে পড়লো। তারা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলো। মা বললেন- তোমরা চলে যাও বাবারা। আমি তোমাদের জন্য দোয়া করবো। বাংলাদেশ তোমরা স্বাধীন করো। আমরা তোমাদের জন্য গর্ববোধ করি।

আশে পাশে ধীরে ধীরে লোকজন জমে যাচ্ছে। ছেলেগুলি অস্থিরভাবে চারদিকে দৃষ্টি বোলালো। পরিস্থিতি বেশি নিরাপদ নয়। খবর পেয়ে পাকিস্তানী সৈন্যরা চলে আসতে পারে। তারা যাবার আগে হুমকি দিয়ে গেলো খালুকে, যদি মুক্তিযোদ্ধাদের কোন ক্ষতি করেন তিনি তাহলে পরেরবার তাকে নির্ঘাত হত্যা করা হবে।

খালু বুক পেতে দিয়ে দুই হাত উঠিয়ে দম্ভ ভরে বললেন- আমার নিজের ছেলে যুদ্ধে গেছে। তোদের রক্তে আমার হাত কোনদিন রাঙবে না। জেনে রাখিস এটা। আমি ইমানদার, খুনী না। মরতে যেদিন হয় মরবো কিন্তু আমার ভয় পাবার কিছু নাই।

ছেলেগুলি যাবার আগে এক অভাবনীয় কাজ করলো। তারা মায়ের পা ছুঁয়ে সালাম করলো। –আপা, দোয়া করবেন যেন দেশ স্বাধীন করে বেঁচে মায়ের কাছে ফিরতে পারি।

মা হুঁ হুঁ করে কাঁদতে লাগলেন। –সবসময় দোয়া করি বাবারা। জায়নামাজে বসে সারাক্ষণ তোমাদের জন্য দোয়া করি। সাবধানে থেকো বাবারা .....

চোখের পলকে গেট পেরিয়ে উধাও হয়ে গেলো মুক্তিযোদ্ধার দলটা। হঠাৎই গভীর নিঃশব্দতা নেমে আসে চারদিকে। মা সিঁড়ির উপরে ধপাস করে বসে পড়লেন। দুই হাতে মুখ গুঁজে কাঁদতে লাগলেন। তার শরীর এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ নয়। এতো উত্তেজনায় তার দেহ ও মন দুটোই অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। খালা ও খালু দু'জনে তাকে তুলে ধরে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। এতক্ষনে দেখলাম পা টিপে টিপে নীচে নামছে মনি ভাই। আমাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে সে ফিসফিসিয়ে বললো- ওদেরকে আমি চিনি। আমার জুনিয়র ছেলেরা। কিন্তু আমাকে সামনে পেলে হেনেস্থা করতে পারতো। রনি যুদ্ধে গিয়ে ভালোই করেছে। হয় এদিক নয় ওদিক, মাঝখানে থাকা ভালো না। দু'জনই হেনেস্থা করে।

বাকি রাতটুকু আমরা বাসার দরজা জানালা সব বন্ধ করে নির্ঘুম কাটালাম। ভোরের দিকে মা ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। খালা অনেক চেষ্টা করেও খালুকে বিছানায় নিতে পারলেন না। তিনি অস্থিরভাবে বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন।

বাবার কাছে যাওয়া

অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে আগষ্ট মাসের প্রথম দিকে বেলুচিস্তানের চমনে একটি ফ্যামিলি কোয়ার্টার পেলেন বাবা। পাকিস্তানে যে অল্প সংখ্যক বাংগালী ডাক্তার ছিলেন তারা তখনও চোখ বুজে নিজের কাজ করে চলেছেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রকোপ তখনও প্রবলভাবে পড়েনি সেখানে। পশ্চিম পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমগুলিও ইচ্ছাকৃতভাবে সমগ্র পরিবেশটাকে

খুবই হালকা ও কখনো বিকৃতভাবে দেখানোর প্রয়াস করে। তারা এটাকে আওয়ামী লীগ ও ভারতের ষড়যন্ত্র বলে চালানোর চেষ্টা করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত বাঙ্গালী সৈনিকদের ও অফিসারদের জন্য নিজেদের ভূমিকা বেছে নেয়াটা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিলো। পশ্চিম পাকিস্তানে থেকে নিজেদের ভুমিকা নিয়ে বাঙালী সৈন্যরা ও অফিসারেরা বেশ দ্বিধাদ্বন্দ্বের দোলায় দুলছিলেন। ইচ্ছা থাকলেও ঝট করে বেরিয়ে এসে স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদান করবার মতো সুযোগ তাদের ছিলো না। এই পরিস্থিতিতে তাদের প্রথম আগ্রহ ছিলো নিদেনপক্ষে তাদের পরিবারদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে আসা। চমন ক্যান্টনমেন্টে বাসা পাবার পরপরই আমাদের যাবার ব্যবস্থা করলেন বাবা। আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে, ঢাকা থেকে করাচীর শেষ ফ্লাইটে, আগষ্ট মাসের মাঝামাঝিতে, আমরা বাংলাদেশের মাটি ছাড়লাম। মা, আমি, রুশী ও মায়ের কোলে ড্যাবডেবে দৃষ্টি মেলে মিন্কী। ঐ ফ্লাইটটা ধরতে না পারলে বাবার কাছে আমাদের আর যাওয়া হতো না।

খালু নিজেই এসেছিলেন আমাদেরকে ঢাকায় পৌঁছে দিতে। ঢাকায় এসে এক দুঃসম্পর্কের চাচার বাসায় দুই-তিন দিন থাকি আমরা। আমাদেরকে একেবারে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে প্লেন না ছাড়া পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থাকলেন খালু। খালার আসার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সংসার ফেলে আসতে পারেন নি। মা বিদায়ের আগে খালুকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদলেন। ছোটবেলা থেকে তাদের সংসারে সন্তানের মতই বড় হয়েছেন মা। মায়ের কাছে তারা বোন ও দুলাভাইয়ের চেয়ে অনেক বড় কিছু। খালুও দেখলাম চশমা খুলে চোখ মুছছেন।

ঢাকা থেকে করাচি যেতে আমাদের অনেকক্ষণ লেগে গেলো। প্রধানত সিংহল হয়ে যেতে হলো বলেই। ভারতের উপর দিয়ে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়নি। মিন্কীর ট্যা ট্যা ফো ফো এবং রুশীর ক্রমাগত ভ্যানভ্যানানিতে মা এবং আমার দু'জনারই বিরক্তির একশেষ হলো। বেশী সমস্যা হলো প্লেন উঠা ও নামার সময়। সবারই কানে তালা লাগে। ওরা ছোট মানুষ সম্ভবত ভয়েই কান্নাকাটি করে। মা বাবার উপরে ভয়ানক রাগ করতে লাগলেন। কেন তিনি ঢাকায় এসে আমাদেরকে সাথে নিয়ে গেলেন না। অবাস্তব কথাবার্তা। কিন্তু মায়ের রাগ হলে মা বাস্তব কথাবার্তা বিশেষ একটা বলেন না। সুখের ব্যাপার হলো আমাদের আগমন উপলক্ষ্যে বাবা এক সপ্তাহের ছুটি নিতে পেরেছিলেন এবং তিনি করাচি আসেন আমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য। করাচি এয়ারপোর্টে তাকে দেখেই আমি ও রুশী ছুটে গেলাম। আমাদেরকে কোলে তুলে নিয়ে বাবা বিজয়ের হাসি দিলেন।

- কেমন ছিলি তোরা?

আমরা উত্তর দেবার আগেই মা তিক্ত কণ্ঠে বকে উঠলেন- তোমার কোন কান্ডজ্ঞান আছে? এই তিন বাঁদর নিয়ে একাকি কিভাবে আসবো ভেবেছো একবার?

বাবা বিশাল এক টুকরো হাসি দিয়ে মিন্কীকে কোলে তুলে নিলেন। মিন্কী বিকট শব্দে কাঁদতে লাগলো। আমরা তাকে খুব বোঝানোর চেষ্টা করলাম - বাবা! বাবা! কাঁদে না।

কে শোনে কার কথা। মায়ের কোলে ফিরে গিয়ে কান্না থামিয়ে সে বড় বড় চোখে বাবাকে পরখ করতে থাকে।

বাবা বললেন - ইচ্ছে থাকলেও আমার দেশে যাওয়া সম্ভব হতো না। এখন কাউকে দেশে ফিরতে দিচ্ছে না সরকার। তোমরা যে আসতে পেরেছো এটাই সৌভাগ্য। এটাই পি আই এ-এর শেষ ফ্লাইট।

মা বিরক্ত কণ্ঠে আপন মনে কিছুক্ষণ বকাবকি করলেন। বাবার সাথে আয়েশা আপা ও জামান দুলাভাই তাদের দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে এসেছিলেন আমাদেরকে নিতে। জামান দুলাভাই একটা সরকারি কাজ করেন। করাচিতে বহুদিন ধরে আছেন। তিনি চমৎকার মানুষ। আয়েশা আপা আমাদের দুঃসম্পর্কের বোন হয়। তার মেজাজের ঠিক পাওয়া কঠিন। এই ভালো তো এই খারাপ। তবে আমাদেরকে তিনি খুব পছন্দ করেন। আমরা মালপত্র নিয়ে এয়ারপোর্ট ছাড়লাম। বাইরে বেরিয়ে প্রথম যে জিনিষটা নজরে পড়লো সেটা হচ্ছে ভীড়। রাস্তাঘাটে মানুষ যেন গিজগিজ করছে। আমার জীবনের অধিকাংশই কেটেছে মফস্বলে বা গ্রামে। হঠাৎ এমন ভীড়ভাট্টা দেখে বেশ অবাকই হলাম। চারদিকে নানান জাতের বাহন আর ফেরিওয়ালাদের এমন সমারোহ আর কখনো দেখিনি। যে রুশী সর্বক্ষণ নিজের পুতুল নিয়ে মেতে থাকে সে পর্যন্ত দু'চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে থাকলো। মিন্কী অবশ্য ট্যাক্সিতে উঠেই ট্যাঁ ট্যাঁ করতে শুরু করলো।

জামান দুলাভাইরা ছোট একটা বাসায় থাকেন। তার মধ্যেই তারা আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। বাবা যেহেতু সপ্তাহ খানেকের ছুটি নিতে পেরেছেন সেহেতু আমাদের ইচ্ছা কয়েকটা দিন করাচিতে কাটানো। তারও করাচির কিছুই দেখা হয়নি। আরব সাগরের নীল জলরাশি পরিবৃত করাচি দর্শনীয় একটা জায়গা। সারা পৃথিবী থেকে টুরিস্টরা আসে। এমন সুযোগ হেলায় ছাড়ার প্রশ্নই আসে না।

করাচিতে জামান দুলাভাইদের বাসায় আমরা সর্বমোট চারদিন থাকলাম। বেশ কিছু জায়গায় আমাদের পদার্পণ হলেও দু'টি জায়গার কথাই বেশি মনে পড়ে। প্রথমটা হচ্ছে ক্লিফটন বিচ, দ্বিতীয়টি কায়েদে আজমের মাজার বা কবরস্থান।

আরব সাগরের তীরে অবস্থিত ক্লিফটন বিচ শহর থেকে বেশি দুরে নয়। সুদীর্ঘ মনোরম বিচ, সাথে একটি ফিস একুয়ারিয়াম এবং ঘোড়া ও উটে চড়বার ব্যবস্থা রয়েছে। করাচির অনেক মানুষের কাছেই দৈনন্দিন ভীড়ভাট্টার বাইরে খানিকটা নির্মল বাতাস আর আনন্দ। এর আগে আমি কখনো কোন সমুদ্র সৈকতে যাইনি। এমন অসম্ভব সুন্দর আর লম্বা সৈকত দেখে আমি যেন বাকহারা হয়ে গেলাম। আরব সাগরের পানি আছড়ে পড়ছে তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে, তারপরে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে হতে শেষতক গড়িয়ে এসে ছুঁয়ে যাচ্ছে আমাদের নগ্ন পা। বাবাকে জুতা মোজা খুলতে দেখে আমিও ফটাফট জুতা মোজা খুলে কাঁধে ঝুলিয়ে ফেলেছি। মা ও রুশী মিন্কীকে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি ভেজা বালুতে পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে তীর ধরে বেশ খানিকটা হেঁটে গেলাম। রুশী খানিকটা দূরত্ব রেখে আমাকে অনুসরণ করছে। হাতছানি দিয়ে ডাকলাম। এলো না। মা ডাকছেন। আমি পিছু ফিরলাম। মাকে রাগিয়ে লাভ নেই। তাছাড়া একুরিয়ামটা দেখার খুব ইচ্ছা আমার। সমুদ্র সৈকতের ঠিক পাশেই একটা দালানের ভেতরে মাছের একুরিয়ামটা অবস্থিত। ছোট বড়

অনেকগুলি ট্যাংকের মধ্যে নানান জাতের সামুদ্রিক মাছ এবং বিরাট বিরাট কচ্ছপ। আমাদের সবারই তাক লেগে গেলো। মা নিজেও এর আগে কখনো একুরিয়াম দেখেননি। তার আগ্রহও আমাদের ভাই-বোনদের চেয়ে কোন অংশে কম হলো না। যে মিল্কী ট্যা ট্যা ছাড়া কথা বলে না সেও দুই চোখ গোল গোল করে মাছ দেখতে লাগলো। সবচেয়ে ভালো লাগলো হাঙর দেখে। হাঙরের কত গল্প পড়েছি। তার তীক্ষ্ণধার দাঁতের ফাঁকে পড়লে আর রক্ষা নেই। সপাৎ করে কেটে দু' টুকরো করে ফেলবে। সেই ভয়াবহ প্রাণীগুলোর কয়েকটিকে কাঁচের ট্যাংকের ভিতরে নিরীহ ভঙ্গিতে সাঁতার কাটতে দেখে স্বভাবতই বেশ বিচিত্র অনুভূতি হলো। অনেকক্ষণ ধরে দেখেও যেন আমার মনের আঁশ মিটলো না। শেষতক বাবা আমাকে একরকম জোর করেই বের করলেন একুরিয়াম থেকে। আমরা গেলাম ঘোড়া ও উটের পিঠে উঠতে। মায়ের ঘোড়ার পিঠে উঠার ভয়ানক শখ। ছোটবেলায় নাকি রাজিয়া সুলতানার গল্প পড়েছিলেন। সে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতো। সেখান থেকেই জীবনে অন্তত একবার ঘোড়ায় চড়বার ইচ্ছা হয়েছে। আগে গ্রামাঞ্চলে অনেকের ঘোড়া থাকতো। যৌবনে নাকি নানারও ছিলো। কিন্তু ছেলেমেয়ে হবার আগে সেইসব সৌখিনতা ছেড়ে দিলেন নানা।

মিল্কীকে বাবার কোলে দিয়ে ঘোড়ায় চড়তে গেলেন মা। অনেক সাধ্য সাধনা করে যাও বা উঠলেন বেচারী ঘোড়াটার পিঠে, ঘোড়া চলতে শুরু করতেই তার চোখ মুখ একেবারে রক্তশূন্য হয়ে গেলো। তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো- পড়ে যাবো তো! পড়ে যাবো তো!
উর্দুভাষী ঘোড়াওয়ালা মিষ্টি হেসে তাকে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করছে কিন্তু মা বিশেষ আশ্বস্ত যে হচ্ছেন না তা কারোরই বুঝতে বাকি থাকছে না। যেমন ছোট মেয়েদের মতো চিৎকার করছেন তিনি! মায়ের কান্ড দেখে রুশী পর্যন্ত ফিক ফিক করে হাসছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে মা এমন আনন্দিত হলেন যে বালুর উপরেই বসে পড়লেন। আমরা সবাই তাকে নিয়ে বেশ হাসাহাসি করলাম। ছোট মিল্কীও কিছু না বুঝে হাসলো। আমার নিজের ঘোড়ার চেয়ে উটের পিঠে চড়বার আগ্রহ বেশি। বাবাকে বলতেই ব্যবস্থা হলো। উটওয়ালা তার উটকে মাটিতে বসিয়ে আমাকে পিঠে চড়িয়ে দিলো। উট সোজা হয়ে দাঁড়াতেই আমার পিলে চমকে উঠলো। নীচ থেকে দেখে মনেই হয়নি প্রাণীটি এতো উঁচু হবে। নীচে পড়ে গেলে নির্ঘাত চোট লাগবে। আমি খুব জোরে আসনের একটা প্রান্ত ধরে থাকলাম। খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে উটটা। প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাথে তার পিঠটা একবার এইদিকে আরেকবার বিপরীত দিকে উঠছে নামছে। বেশ একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। নীচে আসতে আমিও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। বাইরে অবশ্য খুব সাহসী একটা ভাব বজায় রাখলাম। দূর্বলতা দেখলেই মা ও রুশী আমাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করবেন। বাবা নিজেও চড়লেন ঘোড়া ও উটের পিঠে। রুশীকে বহু সাধনা করেও সাথে নিতে পারলেন না। সে মায়ের আঁচলের নিচে পালালো।

কায়েদে আযমের মাজার দেখেও আমরা বেশ মুগ্ধ হলাম। সবকিছু এমন ঝকঝকে তকতকে। তিনিই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ব্রিটিশরা তখন ভারতকে স্বাধীনতা দেবার সিদ্ধান্ত নেয়, নিরুপায় হয়ে তখন গান্ধীর সাথে সমঝোতা করে মুসলিমদের জন্য পাকিস্তানের পৃথক অস্তিত্ব তৈরি করেন তিনি। পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান মূলত মুসলিম

অধ্যুষিত থাকায় এই দুটি অংশ একত্রে পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। ইতিহাসের বইতে পড়েছি কিছু, বাবা-মায়ের মুখে কিছু শুনেছি। বাংলাদেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে তা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেই। বাবা ইতিমধ্যেই আমাকে বুঝিয়েছেন কেন পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হতে চায়। কেন্দ্রে পাকিস্তানী সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। বাবার কথা শুনেই বুঝেছি এই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে একদিনও কাটানো তার ইচ্ছা নয় কিন্তু অবস্থার পাকে পড়ে তার মতো অনেকেরই নিরুপায় অবস্থা।

করাচি থেকে আমাদেরকে যেতে হবে কোয়েটায়। ট্রেনে। প্রায় একদিন লেগে যাবে। জামান দুলাভাইরা আমাদেরকে আরো থাকবার জন্য অনুরোধ করলেও বাবা রাজি হলেন না। কোয়েটা থেকে আমাদেরকে আবার চমন যেতে হবে। সেটাও আরো সাত-আট ঘন্টার পথ। তার ইচ্ছা কোয়েটায় দু-একদিন কাটানো। সেখানে ক্যান্টনমেন্টে তার পরিচিত কয়েকজন আছে। দেখা সাক্ষাৎ করে যাবেন। আমাদেরও খানিকটা বিশ্রাম হবে।
আমাদের ট্রেন যাত্রা শুরু হলো চমৎকার এক সকালে। এর আগে আমি আরো ছোটবেলায় ট্রেনে উঠলেও তেমন কিছু মনে নেই। তাই ট্রেন স্টেশনে গিয়ে এই বিশাল সর্পের মতো নিস্তেজ দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটাকে দেখে আমি বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে গেলাম। সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা বগির পর বগি এবং বিশাল লোহার চাকাগুলো দেখে আমি ও রুশী দু'জনাই খুব আনন্দ পেলাম। আমাদের দৈনন্দিন কোলাহল বন্ধ রেখে আমরা একযোগ হয়ে বগি গোনা শুরু করলাম। সবগুলো গোনা হলো না অবশ্য। বেশ দূরে চলে যাচ্ছি দেখে বাবা আমাদেরকে ডাক দিয়ে ফিরিয়ে আনলেন। মিল্কীও যেন আমাদের আনন্দে ভাগ বসাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। সেও দুই হাত বাতাসে ছুড়ে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়বার চেষ্টা করছে।

ট্রেন ছাড়লো অল্পক্ষণ পরেই। আমাদেরকে প্রথম শ্রেণীর টিকিট দেয়া হয়েছিল। আমাদের নিজস্ব একটা কামরা পেয়ে আমরা সবাই খুব খুশী। বিশেষ করে মা। মিল্কীকে দুধ খাওয়াতে হয়। মানুষজনের সামনে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় তাকে। বাবা-মায়ের নিষেধ অবজ্ঞা করে আমি এবং রুশী দু'জনই জানালা দিয়ে বাইরে মাথা বাড়িয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে যাওয়া ট্রেনটার অবয়ব পরখ করছি মন ভরে। এই দৃশ্যের বোধহয় কোন তুলনা নেই। আর সেই ক্রমাগত ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক ছন্দময় শব্দ, মনে হতে থাকে আমরা যেন কোন এক স্বপ্নপূরীতে চলেছি এক স্বপ্নের বাহনে চড়ে। আমাদের উত্তেজনা দেখে মা তিক্তকণ্ঠে বললেন- তোদের দেখি আনন্দ আর ধরে না। নিজের দেশ ফেলে কোন গুহায় চলেছি কে জানে।

গুহার কথা শুনে আমাদের উত্তেজনা আরো বেড়ে গেলো। বাস্তবিকই যদি গুহায় যাওয়া হয় সেটা খুবই আকাঙ্খিত অভিজ্ঞতা হবে। সে আশায় অবশ্য বাবা গুড়ে বালি দিলেন। তিনি হাসতে হাসতে বললেন - আমরা পাহাড়ী এলাকায় যাচ্ছি বলে যে গুহায় থাকতে হবে সেটা ঠিক নয়।
মা মুখ ঝামটি দিলেন। - দেখা যাবে। ওদিকে তো শুনেছি সব পাহাড়ি মানুষজন আর অনেক ঠান্ডা। এই ছোট বাচ্চা নিয়ে একাকি কিভাবে থাকবো আমি?

বাবা হেসে তাকে আশ্বস্ত করলেন। - আমরা থাকবো ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে। তাছাড়া মানুষজন খারাপ না। তারা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ।
মা খুব একটা ভরসা পেলেন বলে মনে হলো না। ইত্যবসরে বাবা আমাদেরকে নিয়ে বসলেন আমাদের কৌতুহল মেটাতে, বিশেষ করে আমার। কোথায় কোয়েটা? কোথায় চমন? সেখানে কি কি আছে? কারা থাকে? ইত্যাদি। খুব শীঘ্রই আমার জ্ঞানের পরিসীমা যথেষ্ট বিস্তৃত হয়ে গেলো।

কোয়েটা হচ্ছে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের রাজধানী। আফগানিস্তান, ইরান ও পাকিস্তান বর্ডারের খুব কাছাকাছি অবস্থিত শহরটা, নিকটেই দুর্ভেদ্য বোলান পাস। সমুদ্র সীমা থেকে ৫৫০ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা শহরটা চারদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। পাহাড়গুলোর চমৎকার সব নাম - চিলতান, টাকাটু, মোরদার, জারঘুন। এর অবস্থানগত কারণেই পাকিস্তানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ষ্টেশনে পরিণত হয়েছে স্থানটা। করাচি থেকে এর দূরত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচশ' মাইল, লাহোর থেকে সাড়ে সাতশ' ও পেশোয়ার থেকে প্রায় এক হাজার মাইল। কোয়েটা নামটা এসেছে পশতু কোয়াটা থেকে, যার অর্থ দূর্গ। বাস্তবিকই, এর পার্বত্য গড়নের জন্য এটি একটি প্রাকৃতিক দূর্গ হিসাবে কাজ করে। একাদশ শতাব্দীতে গজনীর মাহমুদ কোয়েটা দখল করার পর স্থানটার বৈশিষ্ট্য বেড়ে যায়। ১৫৪৩ সালে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন পারশ্য থেকে ফেরার পথে কোয়েটায় বিশ্রাম নিতে থেমেছিলেন। তিনি ফিরে যাবার সময় তার এক বছরের সন্তান আকবরকে এখানে রেখে যান। আকবর দু'বছর এখানে ছিলেন। হুমায়ুন পরে এসে তাকে নিয়ে যান। মুঘলরা কোয়েটা শাসন করেছিলো ১৫৫৬ সাল পর্যন্ত। তারপরে পার্সিয়ানরা শহরটা দখল করে নেয় যদিও ১৫৯৫ সালে আকবর কোয়েটা পুনর্দখল করেন।

১৮৩৯ সালে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় সাময়িকভাবে শহরটা ব্রিটিশদের দখলে চলে যায়। ব্রিটিশরা তাদের অবস্থান পাকাপোক্ত করতে সক্ষম হয় ১৮৭৬ সালে। দেশভাগের পর কোয়েটার জনসংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পায়, প্রধানত মিলিটারি বেজ এবং ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের ফলের চাষ শুরু হবার পর। ১৯৩৫ সালের ৩১শে মে তে এক ভয়াবহ ভুমিকম্পে তখনকার জনবহুল কোয়েটা শহর প্রায় ভূমিতে মিশে গিয়েছিলো, চল্লিশ হাজার মানুষের সমাধি হয়েছিলো। সেই মৃতের ভুমি থেকে আবার ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে শহরটা কিন্তু বর্তমানের শহরটি গড়ে উঠেছে অনেক সাদামাটাভাবে, ভুমিকম্পের সম্ভাবনা মাথায় রেখে।

বাবার মুখে গল্প শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না। ঘুম ভাঙতে দেখলাম ট্রেন থেমেছে। আমরা সবাই স্টেশনে নামলাম। আমাকে ট্রেনের পাশ ধরে দৌড়াতে দেখে রুশীও পিছু নিলো। অন্য সময় তাকে সাধ্য-সাধনা করেও সাথে নেয়া যায় না। আমরা একেবারে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৌড়ে গেলাম। স্টেশনে মানুষজন বেশী না থাকায় এবং দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকায় বাবা-মা বোধই বিশেষ আপত্তি করলেন না। আমরা আবার দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে এলাম। রুশী হাঁফিয়ে গিয়েছিলো। আমি ওর হাত ধরে নিয়ে এলাম। ওর নির্বাক, অর্থহীন পুতুলগুলোর বাইরে যে কত মজার জিনিষ রয়েছে এটা যে বেচারি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে, ভেবে খুব ভালো লাগছে। ঐসব পুতুল-ফুতুল আমি এখন আর দুই চক্ষে দেখতে পারি না।

যদিও মায়ের মুখে শুনেছি ছোটবেলায় নাকি রানী আপার সাথে পুতুল নিয়ে খুব খেলেছি। আমার নিজেরই নাকি দুটি মেয়ে পুতুল ছিলো। ছি ছি। লজ্জার ব্যাপার।

আবার ছাড়লো ট্রেন। ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক বাদ্যের মূর্ছনা বেজেই চলেছে। রুশী ক্লান্ত হয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। মিল্কী অবশ্য চেয়ে চেয়ে আমাকে দেখছে। আমি মুচকি একটা হাসি দিলাম। বড় হলে তোর সাথে আমার অনেক খাতির হবে, বুঝলি। মনে মনে বললাম। মনে হলো মিল্কী সেটা বুঝলো। সেও একটা মুচকি হাসি দিলো। আমাদের দুই ভাইয়ের সেই মুহূর্তে এক আজীবনের সংযোগ তৈরি হলো। কেউ অবশ্য ব্যাপারটা খেয়াল করলো না। বাবা একটা বই পড়ছেন, মাও ঘুম ঘুম। আমি জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালাম। ধীরে ধীরে রোদের তাপ কমে যাচ্ছে। বিকালের কোমল সূর্য প্রকৃতির বুকে নরম পরশ বুলিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে গাছপালার পরিমাণ কমে আসছে। বাবার মুখে আগেই শুনেছি বেলুচিস্তান হচ্ছে মরুময়, পাহাড়ি এলাকা। সিন্ধু প্রদেশের মতো সবুজ, বৃক্ষময় নয়। করাচি হচ্ছে সিন্ধু প্রদেশে। কথাটা শুনে আমার আনন্দই হয়েছে বেশি। সারা জীবনই বাংলাদেশের অপূর্ব নীলিমাময় সবুজ প্রকৃতির মধ্যে বসবাস করেছি। সবুজ প্রকৃতির প্রতি যে অসম্ভব ভালবাসা আমার হৃদয়ের গভীরে ইতিমধ্যেই জমে উঠেছে তা কেড়ে নিতে পারবে না কেউ। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য, হৃদয়ের অভ্যন্তরে কোন এক নিভৃত কোণে অনুভব করি মরুভুমি আর পর্বতের হাতছানি, রুক্ষতার হাতছানি, দুর্গমতার হাতছানি। আমাকে যেন এক রহস্যময় স্থান বার বার ডেকে যাচ্ছে - আয় খোকা, আয় খোকা। আমি জানালা দিয়ে বাইরে মাথা বাড়িয়ে দেই। কোথায়, কতদূরে তুমি? আর কতদূর যেতে হবে। সর্পিল ট্রেনটা তার শরীরের পরতে পরতে বাঁক তুলে যেন গুণগুনিয়ে উঠলো - এসে গেছি, এসে গেছি। ছোট ছোট টিলার সারি চোখে পড়তে এক অসম্ভব রোমাঞ্চে সমস্ত শরীর শিহরিত হয়ে ওঠে। আর কতদূর?

আমরা যতই কোয়েটার নিকটবর্তী হই ততই দুর্গম হয়ে ওঠে পথ। ট্রেন পাহাড়ের শরীর বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে উঠতে থাকে। উত্তাল ঢাল বেয়ে ওঠার জন্য শক্তিশালী ইঞ্জিন লাগানো হয়। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ঝিকির ঝিক, ঝিকির ঝিক। আমি কান পেতে সেই শব্দ শুনি। চারদিকের পার্বত্য সৌন্দর্যের মাঝ দিয়ে আমরা যেন একদল মানুষ চলেছি কি এক অসম্ভবকে সম্ভব করার উদগ্রীবতা নিয়ে। যতই পেরিয়ে চলেছি পাহাড়ের পর পাহাড়, ততই যেন ঘণীভূত হচ্ছে রহস্যের অবয়ব। সবচেয়ে রোমাঞ্চকর হচ্ছে টানেলগুলো। পাহাড় কেটে বানানো ছোট বড় টানেলের ভেতর দিয়ে যখন ট্রেন চলে তখন সবকিছু ঘুট ঘুটে অন্ধকার হয়ে যায়। আমাদের গড়িয়ে যাবার শব্দ আচমকা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকে সহস্রগুণ পরিবর্ধিত হয়ে। অন্ধকার এবং সেই শরীর কাঁপানো প্রতিধ্বনি যে কারো হৃদয়ে দোলা লাগাবে। টানেল এলেই আমার লোমকুপ দাঁড়িয়ে যায়। রুশীও মনে হয় আমার মতই অনুভব করছে কারণ সামনে টানেল দেখলেই সে আমার হাত শক্ত করে ধরে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আমরা অন্ধকারে ঠায় তাকিয়ে থেকে গুহার দেয়াল দেখার চেষ্টা করি। কিন্তু দৃষ্টি একেবারেই চলে না। সবচেয়ে ভালো লাগে টানেলের শেষপ্রান্তে আচমকা সূর্যের আলো চোখে পড়লে। মনে হয় যেন অন্ধকার এক মায়াপুরী পেরিয়ে অন্য এক স্বপ্নপুরীতে বেরিয়ে এলাম।

আমাদের দু'জনকে অভিভুতের মতো জানালার পাশে সেঁটে থাকতে দেখে মা বার কতক বকা দিলেন। –কি রে, কি এতো দেখছিস তোরা? রুশী একটু দেরীতে কথা বলেছে। সাড়ে তিন তার বয়েস হলেও সে এখনো পরিষ্কার করে কথা বলে না। মায়ের প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তার মুখ থেকেই এলো –পাহাড় দেখি। পাহাড়।

আমি মায়ের প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা করি না। মা এইসব পাহাড়, পর্বত, নদী-নালা কিছুই বোঝেন না। সারাক্ষণ ঘুমা ঘুমা আর খা খা করেন। বাবা ইতিমধ্যে বাংকারে হাত পা ছড়িয়ে একটা ঘুম দিচ্ছেন। এই এলাকা দিয়ে তাকে কয়েকবার যাতায়াত করতে হয়েছে। প্রথমত বড়দের হাবভাব দেখে মনে হয় প্রকৃতির প্রতি তাদের আগ্রহ কম, দ্বিতীয়ত একবার যদি কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখা হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে ঘুম তো আসবেই। রুশী চিৎকার করছে টালেন, টালেন। ওর 'ল' ও 'ন' এ এখনও প্রচুর সমস্যা আছে। আমি ওকে শুধরে দেবার চেষ্টা করি-টালেন নয় টানেল। কিন্তু প্রতিধ্বনিতে আমার কথা চাপা পড়ে যায়।

রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি টের পাই না। ভোরের প্রথম আলো ফুটতেই আবার লাফিয়ে উঠি। পাহাড়ের শরীর বেয়ে লালচে সূর্যের নীল আকাশে উদয় দেখে হৃদয়টা ভরে ওঠে। পাহাড়ে এটা আমার প্রথম আগমন। প্রথমবারেই সে আমার হৃদয়ের প্রতিটি নিভৃত কোণ পর্যন্ত জয় করে নিলো। আমি মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে পরখ করতে লাগলাম কিভাবে একটি নতুন দিন আলিঙ্গন করে এই দূর্গম পার্বত্য এলাকাটিকে। কিভাবে কঠিন প্রস্তরে ঠিকরে পড়ে প্রথম সূর্য, গাছের পাতায় বিকিয়ে উঠে সোনালী রোদ, ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর শরীরে রূপালী পরশ বুলিয়ে যায় রশ্মি। আমার দুই নয়ন ভরে শুধু দেখতে থাকি আর কান ভরে শুনতে থাকি আমাদের বাহনের ক্রমাগত চলার শব্দ –দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুর্গম গিরি কান্তার মরু .....
নজরুলে আমার ইতিমধ্যেই হাতেখড়ি হয়েছে বাবার বদান্যতায়। এই অপূর্ব পরিবেশে ফের যেন আমার নজরুলকেই মনে পড়লো। দুর্গম গিরি কান্তার মরু, ঝিকির ঝিক, দুর্গম গিরি কান্তার মরু ..... এর চেয়ে রোমাঞ্চকর আর রহস্যময় কি হতে পারে?

প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ট্রেনে কাটিয়ে পরিশেষে কোয়েটা পৌঁছলাম আমরা। এখানে আমরা ক্যান্টনমেন্টে বাবার এক বন্ধুর বাসায় একদিন থাকবো। তারপর ট্রেনে চেপে চলে যাবো চমন। আরো সাত-আট ঘন্টার পথ। চমনের অবস্থান একেবারে আফগানিস্তান বর্ডারে। বিখ্যাত খোজাক পাস পার হয়ে যেতে হয়। আমার ট্রেন থেকে নামতেই ইচ্ছা হচ্ছিলো না। আমরা সেদিনের জন্য ক্যাপ্টেন বজলুরের বাসায় উঠলাম। তার স্ত্রী সালেহা চাচী খুবই ভালো। তিনি আমাদেরকে খুব আদর যত্ন করলেন। তাদের একমাত্র সন্তান মতির সাথে আমার ঝট করেই বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। মতি প্রায় আমারই বয়েসী, সামান্য ছোট হতে পারে। আমরা খুব ছুটাছুটি করে খেলতে লাগলাম। অন্য সময় রুশী খেলতে চাইলে তাকে সাধারণত ধমক খেতে হয়। কিন্তু এই যাত্রায় তার সাথে আমার একাত্মতা যেন খানিকটা বেড়েছে। সে আমার কাছে খানিকটা হলেও প্রমাণ করতে পেরেছে যে তার পুতুলের বাইরেও আরেকটা দুনিয়া আছে। আজ তাকেও খেলতে নিলাম।

বিকালের দিকে সবাই মিলে গেলাম জিন্নাহ রোডের উপরে অবস্থিত প্রধান বাজারে। স্থানটা বিশাল পাগড়ি পরা পাঠান আর নক্সীতোলা লালটুপি পরা বেলুচি হকারে ভর্তি। পাহাড়ি মেয়েরা সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা বাহারি পোশাক পরে কাপড় বেচছে। অনেক ভীড় সেখানে। এমন কিছু নেই যা চোখে পড়লো না - বেলুচিদের চুমকির কাজ করা জিনিসপত্র, ফার কোট, জুতা-স্যান্ডেল, আফগানি কার্পেট, নানান ধরনের ঝকমকে পাথর, নানান জাতের ফলমুল, বাদাম, পেস্তা। আমরা কিছু খাবার-দাবার কিনলাম। রুশী বাচ্চাদের জন্য তৈরী একটি চকচকে লাল শাল নেবার জন্য বায়না ধরলো কিন্তু বাবা বিশেষ আমল দিলেন না। বুঝলাম বাবার হাত টান। রুশী ছোট মানুষ, এইসব কি আর বুঝবে? একটা পাহাড়ি জুতা বড় মনে ধরেছিলো, বাবার শুকনা মুখ দেখে চেপে গেলাম। ধমক খাবার কোন মানে হয় না। রাতে বাবা-মায়েরা অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করলেন। লম্বা ট্রেন যাত্রার পর মিল্কী ক্লান্ত হয়ে গভীর ঘুম দেয়ায় মা কিঞ্চিৎ সময়ের জন্য যেন একটু মুক্তি পেলেন। রুশী অবশ্য শালের দুঃখে বেশ খানিকক্ষণ নাকি কান্না দিয়ে ঘুমিয়ে গেলো। আমি আর মতি দীর্ঘক্ষণ বন্দুক বন্দুক খেললাম। মতি আমার গুলি এড়ানোর জন্য ডাইভ দিতে গিয়ে একটা কাচের গ্লাসের বিচুর্ণ অবস্থা করবার পর বড়দের টনক নড়লো। আমাদেরকে বিরস মুখে বিছানায় যেতে হলো।

পরদিনই আমরা আবার ট্রেনে উঠলাম। মতির কাছ থেকে বিদায় নিতে কষ্টই হলো। দেশের পরিচিত গন্ডি ছেড়ে এতো দূরে এসে ঝট করে এমন চমৎকার একজন বন্ধু পাওয়া কি সহজ কথা? আমি তাকে চমনে যাবার নিমন্ত্রণ জানিয়ে ট্রেনে চড়লাম। বজলুর চাচা ও সালেহা চাচী দু'জনই বারবার করে বলতে লাগলেন তারা সুযোগ পেলেই চমন আসবেন। তাদের তিনজনকে পেছনে ফেলে অবশেষে সম্মুখ পানে এগিয়ে চললো আমাদের বাহন –দুর্গম গিরি কান্তার মরু, ঝিকির ঝিক, দুর্গম গিরি কান্তার মরু .... আমার শরীর আবার শিহরিত হতে থাকে। এমন অসম্ভব ভালো লাগা একমাত্র গাঁয়ের এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলা ধুলিময় মেঠো পথের দর্শনেই পেয়েছি। ঝট করেই সবার স্মৃতি মানসপটে ভেসে ওঠে - দাদু, দাদী, চাচু, ঝিমা, রানী আপারা, মীনু আপারা সবই কেমন আছে কে জানে? যুদ্ধের প্রকোপ বেড়েছে, মানুষ মরছে। বজলুর চাচার সাথে বাবাকে গম্ভীর মুখে সেই ব্যাপার নিয়ে আলাপ করতে শুনেছি। তাদেরকে সাবধানে থাকতে হয়। এখান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোগদানের কোন সুযোগ তাদের নেই। বিন্দুমাত্র পদস্খলন হলে কোর্ট মার্শাল হয়ে যাবে। তাদেরকে যথাযথ সময়ের প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। সাধারণ অফিসার বা সেপাইরা এখনও তাদেরকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছে না, কিন্তু সেই পরিস্থিতি যে বদলাবে না সেই নিশ্চয়তা কোথায়? পরিবার পরিজন নিয়ে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে কে বিপদে পড়তে চায়? বাংলাদেশী অফিসাররা খুবই সাবধানে থাকেন। যুদ্ধের ব্যাপারে আগ্রহ না দেখানোর চেষ্টা করেন। অকারণে মানুষকে সন্দিহান করে তুলবার তো কোন প্রয়োজন নেই।

পাহাড়ের শরীর বেয়ে আবার গড়িয়ে চলেছে ট্রেন। কোয়েটা থেকে চমনের পথটুকু শুনেছি আরো রোমাঞ্চকর। কারণটা বুঝতে অসুবিধা হলো না। সম্পূর্ণ এলাকাটাই পার্বত্য। পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে আফগানিস্থান বর্ডারের দিকে এগিয়ে চলেছি আমরা। শুনেছি সেখান থকে

কান্দাহার নাকি বেশী দূরে নয়। এই ট্রেন যাত্রার সবচেয়ে আকর্ষনীয় এবং রোমাঞ্চকর অংশ হচ্ছে খোজাক পাস টানেল। প্রায় ৭৫০০ ফুট উঁচুতে দাঁড়িয়ে থাকা এই টানেলটি ৩.২ মাইল লম্বা, চমনে অবস্থিত পাকিস্তান রেলওয়ে টার্মিনালে গিয়ে তবে শেষ হয়েছে। বাবা গল্প করলেন, এটা নাকি দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দীর্ঘ টানেল। খুবই চমৎকার ইঞ্জিনিয়ারিং এর এক নিদর্শন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে টানেলের কাজ শুরু হয়। পাহাড়ের দুই দিক থেকে একযোগে টানেলের কাজ শুরু করা হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক মাঝামাঝি গিয়ে তাদের মিশবার কথা। কিন্তু বাস্তবে যখন তা হলো না তখন যে ইঞ্জিনিয়ার দায়িত্বে ছিলো সে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে। পরে অবশ্য একটা সমাধান বের করা হয় এবং ১৮৯২ সালে টানেলটি খুলে দেয়া হয়।

আমরা দুই ভাই বোন আকুল অপেক্ষায় আছি কখন টানেল আসবে - খোজাক পাস টানেল। একটু পর পরই আমরা ছোট ছোট টানেল পার হচ্ছি কিন্তু খোজাক পাস টানেলের গল্প শোনার পর এখন অন্য সবকিছুর প্রতি আমাদের আগ্রহ নিতান্তই নীচু পর্যায়ের। বাবা আমাদেরকে ব্যস্ত রাখার জন্য আমাদের চতুর্দিকে জুড়ে থাকা নানান ধরনের পাহাড় ও পাথরের গল্প করতে লাগলেন। হাজার হাজার বছর আগে অগ্নুৎপাতের ফলে যে লাভার স্রোত সৃষ্টি হয়েছিলো সেখান থেকেই বিভিন্ন ধরনের পাথরের শুরু এই বেলুচিস্তানের পার্বত্য এলাকায়। এই অঞ্চলে প্রধানত দুই ধরনের লাভা স্রোত হয়েছিলো - আহ আহ ও পা-হোয়-হোয়। দড়ির মতো পাকানো আকৃতি অথবা বিশাল কোণাকৃতি চেহারার পাথরের চাঙগুলি বস্তুত জমাট বদ্ধ লাভা। দেখলে মনে হয় যেন কোন শিল্পী আপন মনে তৈরী করেছেন এই অপূর্ব স্থাপত্য। আহ-আহ্ ও পা-হোয়-হোয় শব্দ দুটি এসেছে হাওয়াইয়ান থেকে। যে লাভাস্রোতটি চোখা, কোণাকৃতি লাভার চাঙরগুলোকে ধারণ করে তাকে বলে আহ-আহ। এই জাতীয় লাভাস্রোত ১০০ মিটারের মতো পুরু হতে পারে। পা-হোয়-হোয় প্রবাহিত হবার সময় মসৃণ একটা বহিরাবরন তৈরি করে এবং সাধারণত ১ মিটারের বেশী পুরু হয় না। লাভা প্রস্তর ছাড়াও এই পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট ও বিচিত্র রঙ।

শেষ পর্যন্ত আমরা খোজাক পাস টানেলে প্রবেশ করলাম। রূপকথার এক সর্পিল দানবের মতো আমাদের বাহনটা ছন্দময় ভঙ্গিতে প্রবেশ করতে থাকে আঁধার ঘেরা জগতে। আচমকা আমরা নিজেদেরকে আবিষ্কার করি এক অন্তহীন রহস্যময় পাতালপুরীতে। দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে দানবের ক্রদ্ধ গর্জন, প্রতিধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায় অতীতের কোন মুহুর্তে, নতুন গর্জনের ধ্বনি অধিকার করে তার স্থান। আমি এই অভাবনীয় রহস্যঘেরা ধ্বনি-প্রতিধ্বনির জগতে নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলি। দু'চোখ মেলে তাকিয়ে থাকি বাইরের অন্ধকারে, দু' কান খুলে শুনি প্রতিটি শব্দ। আমার জামা শক্ত করে দু'হাতে চেপে ধরে বসে আছে রুশী। মা জেগে আছেন। তিনি এক পর্যায়ে অসহিষ্ণু হয়ে বললেন - কত লম্বা এটা? শেষ হয় না কেন?

মায়ের অন্ধকার ভীতি আছে। বিশেষ করে বন্ধ, আলোহীন স্থানে তিনি ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করেন। মিল্কী অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ও জানলোও না কি ভয়ানক এক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হলো। হয়তো ফিরবার সময় ওর বোঝার বয়েস হবে। কবে ফিরতে পারবো কে জানে?
খুব ধীর লয়ে এগুতে থাকে ট্রেন। সময় যেন থেমে গেছে এই পাতালপুরীর গহীনতায়। 'কান্ডারী হুশিয়ার!', 'কান্ডারী হুশিয়ার!', 'কান্ডারী হুশিয়ার!' - সবাইকে নিয়ত সতর্ক করে আঁধারের বুক চিরে ছুটছে দানব। অবশেষে দূরে আলোর ছটা চোখে পড়ে। আমি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি। যাহ্! মা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। - বাঁচা গেলো। এতোক্ষণ মাটির নীচে থাকা যায়?

পাতালপুরীর রহস্যময়তা পেছনে ফেলে আবার আমাদের দৈনন্দিন পৃথিবীতে ফিরে এলাম আমরা।
চমন। ছোট শহর। কিন্তু বেশ বড়সড় ক্যান্টনমেন্ট। বাবা অফিসার্স কোয়ার্টার পেয়েছেন। প্রশস্ত দুই বেডরুমের বাসা। দেখেই মায়ের পছন্দ হয়ে গেলো। এখানে অফিসার খুব বেশী নেই। সর্বমোট ছয় সাত জন, তার মধ্যে বাংলাদেশী আর মাত্র দু'টি পরিবার, মেজর আলতাফ ও মেজর জাফর। দু'জনই বাবার সিনিয়র র‍্যাংকের কিন্তু বাবার সাথে তাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। একরকম বন্ধুর মত। বাবাই এখানে একমাত্র ডাক্তার। মেজর আলতাফের স্ত্রী নুরী আন্টি খুবই মিশুক মহিলা। প্রথম দিনেই তিনি খাবার দাবার নিয়ে হাজির হলেন। তার সাথে এলেন তার দুই ছেলেমেয়ে - রৌশন ভাই ও রুশনী আপা। তাদের বয়েস বারো চৌদ্দর বেশি হবে না। দু'জনাই খুব হাসিখুশী। আমাকে এবং রুশীকে পেয়ে তাদের আনন্দ আর ধরে না। বুঝলাম চমনে তাদের সময় বিশেষ ভালো কাটছে না। এখানে তাদের বন্ধু বান্ধব কেউ নেই বললেই চলে। স্কুলেও যাওয়া হয় না। ফলে নতুন কেউ এলে খুবই ভালো লাগে। তাদের দু'জনকে আমাদের ভয়ানক পছন্দ হলো। সুযোগ পেলেই আমরা এক দৌড়ে তাদের বাসায় চলে যেতাম। মাত্র দু'টি বাসা পরেই তাদের বাসা।

মেজর জাফর এবং তার স্ত্রী আসিফা আন্টি কিঞ্চিৎ চুপচাপ ধরণের। তাদের দু'টি ছেলে - বাশার ও রাতুল। বাশার আমার চেয়ে সামান্য বড়, রাতুল সামান্য ছোট। সমবয়েসী বিধায় দু'জনার সাথেই ঝট করেই খাতির হয়ে গেলো, যদিও রাতুলের সাথেই ঘনিষ্টতা বেশী হলো। খুব শীঘ্রই আমরা আবিষ্কার করলাম আসিফা আন্টি ও নুরী আন্টির মধ্যে সম্পর্ক কিঞ্চিৎ শীতল। তাদের দুই পরিবারের মধ্যে যাতায়াত কম। আমরা যাওয়ার পর অবশ্য মা বেশ কয়েকবার বাসায় সবাইকে দাওয়াত দিলেন। আমরাও তাদের বাসায় দাওয়াতে গেলাম। সম্পর্কের প্রাথমিক শীতলতাটুকু কেটে যেতে খুব দীর্ঘদিন লাগলো না।

চমন একেবারে আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী শহর। এই এলাকায় বেলুচিদের পাশাপাশি পশতুনদের উপস্থিতি খুবই জোরালো। তারা ধর্মভীরু এবং খুবই স্বাধীনচেতা। মেয়েরা বোরখা খুব একটা না পরলেও রঙিন কাপড়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখে, শুধু মুখটা দেখা যায়। পুরুষেরা তাদের প্রথাগত ঢোলা পায়জামা, লম্বা কুর্তা পরে, মাথায় পাগড়ি অথবা টুপি। অধিকাংশই বিশালাকার। প্রথম যে স্থানীয়দের সাথে আমাদের পরিচয় হলো তারা জহীর খান ও তার পরিবার। জহীর খান বেলুচি। খুবই গরীব। সে ক্যান্টনমেন্টে মালির কাজ করে। যদিও

সিভিলিয়ানদের ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে বাস করবার কথা নয় কিন্তু তবুও তার ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রম করা হয়েছিলো। ক্যান্টনমেন্টের সীমানার ভেতরে, অফিসার্স কোয়াটারের অনতিদূরে অফিসাররাই তাকে তার পরিবার সহ থাকবার ব্যবস্থা করে দেয়। জীর্ণ-শীর্ণ ইটের দালান। সেখানে জহীর খান তার স্ত্রী ফাতিমা, মা, বাবা ও অর্ধ উম্মাদ ভাই আমীর খানকে নিয়ে থাকে। সে স্বভাবে অমায়িক হলেও, কথাবার্তা বলে খুবই কম। প্রায় সারাক্ষণ আপনমনে কাজ করে। তাদের বাসা আমাদের কোয়ার্টার থেকে সিকি মাইলের বেশী হবে না। মাঝেমাঝেই আমি বাশার ও রাতুলের সঙ্গী হয়ে চলে যেতাম সেখানে। ফাতিমা নিঃসন্তান। তাকে দেখে অবশ্য বেশ কমবয়েসী মনে হয়। আমাদেরকে দেখলে সে খুবই খুশী হয়। দারিদ্র ঘোচানোর জন্য শাশুড়ীর সাথে বসে বসে নানান ধরনের চুমকি বসানো কাপড় সেলাই করে সে। অফিসারদের স্ত্রীরা অনেকেই সেগুলো কেনে। কিছু কিছু বাজারে বিক্রি হয়। আমরা গেলেই সে এক গাল হেসে বলে –কেমন আছো তোমরা? একটা বৈয়ম থেকে ঝটপট কিছু লজেন্স বেরিয়ে আসে। অল্প দামের জিনিস, কিন্তু ফাতেমার সহজ ব্যবহারের সমন্বয়ে তার স্বাদ হয়ে যায় অনন্য। আমরা তিনজন কাড়াকাড়ি করি। তবে জহীরদের বাসায় যাওয়ার পেছনে ফাতেমা ছাড়াও অন্য আকর্ষণ রয়েছে। সে হচ্ছে আমীর খান। তাদের ভিটে বাড়ির ঠিক মাঝখানে একটি কুয়া খনন করছে আমীর। কুয়া প্রায় ফুট পনেরো গভীর হয়েছে। আমীর দিনের অধিকাংশ সময় সেই কুয়ার মধ্যেই কাটায়। তার মুখভর্তি দাড়ি, ময়লা শরীর। একটা কোদাল দিয়ে প্রায় সর্বক্ষণই মাটি কুপিয়ে চলেছে সে। আমরা অসম্ভব কৌতুহল নিয়ে কুয়ার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার কর্মকান্ড দেখি। সে আমাদের উপস্থিতি বিশেষ গ্রাহ্য করে না। আপন মনে কাজ করে চলে। ফাতেমা আমাদেরকে ফিস-ফিসিয়ে সতর্ক করে - কোন কথা বলো না। ক্ষেপে গেলে খবর আছে।

আমরা এই জাতীয় সতর্কবানীর পর আরো এক পা পিছিয়ে যাই। এতো অল্প বয়সে তার মাথায় কেন সমস্যা দেখা দিলো এটা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করি। জহীরের মা বুড়ী হলেও বেশ ভালো। ফাতেমার মতো সেও আমাদের উপস্থিতি পছন্দ করে। মেজাজ ভালো থাকলে এটা সেটা গল্পও করে। তার মুখেই শুনলাম ছোট বেলায় কোন্ এক দূরারোগ্য রোগে ভুগে এই অবস্থা আমীরের। এই এলাকায় ভালো ডাক্তার নেই। থাকলেও দেখানোর ক্ষমতা ছিলো না। ছেলেটিকে নিয়ে তার মনে অনেক দুঃখ। তার স্বামী কয়েক বছর আগে মারা যাবার সময় জহীরকে বলে গেছেন ভাইয়ের দেখাশোনা করতে। জহীরের জন্য এটা অত্যাচারের মতো, তবুও সে যতটুকু পারছে করছে। কয়েকবার মাথার ডাক্তারের কাছে নেয়া হয়েছে, কিন্তু তারা বিশেষ কোন ভরসা দিতে পারেননি। ছেলেকে বিয়ে দেবার ইচ্ছা বুড়ীর, কিন্তু কে এই পাগল ছেলেকে বিয়ে করবে।

চমনে প্রচন্ড শীত পড়ে, সাধারণত ডিসেম্বর মাসের থেকে শুরু। আগষ্টের শেষ দিকে আবহাওয়া বেশ আরামদায়ক। বিশেষ করে আমাদের জন্য। সারা ক্যান্টনমেন্টে ছুটাছুটি করতে আমাদের কোন বাধা নিষেধ নেই। মাঝে মাঝে রুশীও আমাদের সঙ্গ নেয়। একদিন সে অবশ্য একটা ভয়ানক কান্ড করে ফেললো। কাউকে কিছু না বলে একাকি বেরিয়ে পড়লো।

দুপুরের দিকে মায়ের উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে ভড়কে গেলাম। কি ব্যাপার? রুশীকে কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আমি, বাশার ও রাতুল চারদিকে খোঁজ খোঁজ শুরু করলাম। বাবা পর্যন্ত চলে এলেন কাজ থেকে। অবশেষে রুশীর সন্ধান পাওয়া গেলো জহীরদের বাসায়। ফাতেমাই আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। গিয়ে দেখি মাটিতে বসে তিন ইঞ্চি পুরু একটা রুটির টুকরো আয়েস করে চিবাচ্ছে রুশী। মা মিন্কীকে কোলে নিয়েই চারদিকে পাগলের মতো খুঁজছিলেন। আমার চিৎকার শুনে দৌড়ে এলেন। রুশীকে দেখে তার অশ্রু আর বাঁধ মানলো না। রুশী অবশ্য বোকার মতো ফিক ফিক করে হাসতে লাগলো। সেই রাতেই তার পেট ছুটলো। স্থানীয় পুরু আটার রুটি বেশ মুখরোচক হলেও রুশীর পেটে তা সইলো না। পরবর্তি দুইদিন তাকে বিছানায় শুয়ে বসে কাটাতে হলো। তবে এই ঘটনার ফলে মায়ের বেশ একটা উপকার হলো। এতোদিনে জহীরদের বাসায় তার কখনো যাওয়া হয়নি। ফাতেমা প্রায় মায়েরই বয়েসী। ফাতেমার হাসিখুশী ব্যবহারের জন্য তার সাথে মায়ের খুব খাতির হয়ে গেলো। মা প্রায়ই মিন্কী ও রুশীকে নিয়ে তার বাসায় যাতায়াত শুরু করলেন। শীঘ্রই লক্ষ্য করলাম তিনিও চুমকির কাজে হাত দিয়েছেন। বুঝলাম ফাতেমা তাকে শেখাচ্ছে। চুমকির কাজ ছাড়াও ফাতেমা তাকে উলের কাজও শেখালো। আমার এই সব হাতের কাজে তখন ভয়ানক আগ্রহ। আমি রাতের বেলা বিছানায় যাবার আগে মায়ের সাথে বসে বসে উল বুনি। আমি বিশেষ রকম ব্যুৎপত্তি অর্জন করলাম উলের ফিতা তৈরিতে। একটা কাঠের ব্লকের মাঝখানে আধা ইঞ্চির মতো ছিদ্র। একদিকের সমতলে ছিদ্রটিকে কেন্দ্র করে চার পাঁচটি পেরেক পোতা। এই কাঁটাগুলিতে উল জড়িয়ে জড়িয়ে ফিতা বুনতে হয়। ফিতা ছিদ্রের অন্য প্রান্ত দিয়ে দীর্ঘ হতে থাকে। মা আসন্ন শীতের জন্য মিন্কীর মাথার টুপি বুনছিলেন, আমি সেই টুপির ফিতা বুনেছিলাম।

এই সুদূর সীমান্তবর্তী শহরে মানুষজন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলো না। বাবা বি.বি.সি বা ঐ জাতীয় বিদেশী সংবাদ সংস্থার খবর শুনে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেন। মাঝে মাঝে আলতাফ আঙ্কেল ও জাফর আঙ্কেলের সাথে নীচু গলায় আলাপ করেন। আমি লুকিয়ে চুরিয়ে শুনে যতটুকু বুঝতে পারি - বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জোর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। মুক্তিবাহিনীরা তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে পাকিস্তানী সৈন্যদের বিরুদ্ধে। ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাতেই তাদের সাফল্য সবচেয়ে বেশী। ভারত তার সহযোগীতার হাত দৃঢ় করেছে। পাকিস্তানও সৈন্যসংখ্য বৃদ্ধি করছে। বিভিন্ন সীমান্তে ভারতের সৈন্যদের সাথে তাদের সরাসরি গুলি বিনিময়ও হচ্ছে। যুদ্ধের মোড় কোনদিকে ঘুরবে কিছুই বলা যাচ্ছে না। আমি শুধু মনে মনে আকুল প্রার্থনা করি খুলনাতে এবং গ্রামে কারো যেন কোন ক্ষতি না হয়। বিশেষ করে রানী আপার জন্য মনে অনেক শংকা জাগে। বদমায়েশ বশীর তার পিছু ছাড়বে সেই আশা করা যায় না।

বাবাদের শীতকালিন মিলিটারি একসারসাইজ শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসে, চলে নভেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত। বাবা একদিন সকালে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীমান্ত বরাবর বেলুচিস্তানের অন্য একটি স্থানে চলে গেলেন তার ইউনিটের সাথে। মা খুব কান্নাকাটি করলেন। আমার নিজেরও মনটা খারাপ হলো। বাবা বেশ কিছুদিন ফিরবেন না। বাবা যাবার আগে আমাকে বুকে

জড়িয়ে ধরে বললেন - মায়ের দিকে চোখ রেখো খোকা। মা একা রুশী আর মিল্কীকে সামলাতে পারবে না। তুমি সাহায্য করো।

এই নতুন দায়িত্ব পেয়ে গর্বে আমার বুক এক হাত ফুলে যায়। আমি গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ি। আলতাফ আঙ্কেল ও জাফর আঙ্কেলও চলে গেছেন শীতকালিন একসারসাইজ এ। মিথ্যে বলবো না, আমাদের ছেলেদের জীবন কিঞ্চিৎ মুক্তময় হয়ে গেলো তার পরে। বিশেষ করে মা বাস্তবিকই রুশী ও মিল্কীকে সামলাতে গিয়ে এমন হিমসিম খেতে লাগলেন যে আমার পিছু ধাওয়া করবার সময় বা শক্তি কোনটাই তার অবশিষ্ট থাকে না। আমি, বাশার ও রাতুল এই সুযোগে এলাকাটা খুব চষে বেড়াতে লাগলাম। রৌশন ভাই এবং রুশনী আপার সাথেও খুব আড্ডা হয়। রৌশন ভাই আমাদেরকে ছোটদের কয়েকটা তাস খেলাও শিখিয়ে ছিলো। আমরা সুযোগ পেলেই খেলতে বসে যাই। মায়ের চোখে না পড়ার চেষ্টা করি। মা আবার বাবা এলে বলে দিতে পারেন। অকারণে হুজ্জুত হবে।

অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে মুক্তিযোদ্ধাদের তৎপরতা অনেক বেড়ে গেছে বলে আমরা শুনলাম। পাকিস্তানী বাহিনীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করে আশি হাজার করা হলো। ভারত এখনও সরাসরি যুদ্ধে জড়ায়নি তবে তারা নানানভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা করছে। পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় মুক্তিযোদ্ধাদের মূল ঘাটি। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতের সীমান্তবর্তী শহরগুলোতে রিফিউজি ক্যাম্পে গিয়েছে। আচমকাই পাকিস্তান আর্মি সিদ্ধান্ত নিলো ৪৪ এফ এফ ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটিলিয়নকে চমন থেকে মিরপুর খাশে পাঠাবে। স্থানটি সিন্ধুতে, ভারতের রাজস্থান সীমান্তের নিকটবর্তী। বাবাকে অর্ডার দেয়া হলো এই ব্যাটেলিয়নের সাথে মেডিকেল কভারে যাবার জন্য। তার শীতকালীন একসারসাইজ মুলতবি থাকবে। যাবার আগে বাবা খুব অল্প সময়ের জন্য আমাদের সাথে দেখা করতে এলেন। খবর শুনে মা আগেই সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছিলেন। তার অবস্থা এমনই সঙ্গীন হয়ে উঠেছিলো যে রীতিমতো স্যালাইন লাগাতে হচ্ছিলো। নুরী আন্টি ও আসিফা আন্টি থাকায় রক্ষা। তারাই একরকম রুশী ও মিল্কীকে দেখ্ভাল করছিলেন। বাবাকে দেখেই মা হাউমাউ করে কান্না জুড়লেন। তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছে কেন?

বাবা হাসতে লাগলেন। - আমি ডাক্তার। আমাকে যুদ্ধে পাঠাবে কেন? আমি যাবো সৈন্যদের সাথে মেডিকেল কভারে। ওদেরকে পৌঁছে দিয়ে আবার চলে আসবো। তুমি খামাখা এতো ভয় পাচ্ছো কেন?

মা বিশেষ সান্তনা পেলেন না। বাবা বিদায় নিয়ে আবার চলে যাবার সময়েও খুব কাঁদতে লাগলেন। তার দেখাদেখি স্বভাব মতো রুশীও নাকের জল চোখের জল এক করলো। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে মিল্কী খিল খিল করে হেসে উঠলো। যেন এই পুরো ব্যাপারটিতেই সে খুব মজা পাচ্ছে।

আর্মিদের গাড়ির বিশাল ক্যারাভান নিয়ে রওনা দিলো বাবাদের ব্যাটেলিয়ন। মীরপুর খাশে পৌঁছাতে তাদের পাঁচ-ছয়দিন লেগে গেলো। নির্বিঘ্নেই পৌঁছে গেলেন তারা। সেখানে পৌঁছে বাবাকে বলা হলো তার নিজস্ব ইউনিট খুঁজে নিতে। বাবা ছিলেন ৩১ ফিল্ড এম্বুলেন্সের সদস্য।

সৌভাগ্যবশতঃ তার ইউনিট তখন নিকটবর্তী আরেকটি ব্যাটেলিয়নের সাথে ছিলো। তিনি তাদের সাথে যুক্ত হয়ে মিরপুর খাশেই থাকলেন পরবর্তি নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত। ইতিমধ্যে আর্মি সিদ্ধান্ত নিলো ফ্যামিলিদেরকে চমন থেকে সরিয়ে কোয়েটা নিয়ে যাবার। জিনিষপত্র গুছিয়ে আর্মিদের গাড়িতেই আমরা বেশ কয়েকটা পরিবার কোয়েটা চলে এলাম। বাবার সাথে ইতিমধ্যে আমাদের আর কোন যোগাযোগ হয়নি। তবে আমাদের বলা হয়েছে বাবার মতো অন্যান্য যারা ডিউটিতে আছেন তারা সবাই সুযোগ পেলে কোয়েটায় তাদের পরিবারের সাথে মিলিত হতে আসবেন। মায়ের তর সয় না। তিনি সারাক্ষণ জায়নামাজে মাথা ঠুকছেন।

কোয়েটা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই আমাদেরকে বাসা দেয়া হলো। বেশ বড়সড় বাসা। আমাদের সাথে সংযুক্ত পাশের বাসায় উঠলো রৌশন ভাইরা। রাতুলরা বাসা পেলো খানিকটা দূরে।

শুজা রশীদ, টরেন্টো, কানাডা, ২১/০৩/২০০৬

বিঃ দ্রঃ

জনাব শুজা রশীদ প্রবাসে বসে স্বদেশে নিজের হারানো দিনগুলোকে নিয়ে 'দামামা' নামে একটি বই লিখেছেন। আসছে মে - ২০০৬ তিনি তা বই আকারে ছাপতে যাচ্ছেন। তার আগে আমাদের কর্ণফুলী'তে তাঁর এ অপ্রকাশিত বইটি ধারাবাহিকভাবে আমাদের অগনিত পাঠকদের জন্যে তিনি পরিবেশন করছেন। প্রবাসী ব্যস্ততায় লেখা তাঁর এ প্রকাশিতব্য বইটি পড়ে কেমন লাগছে পাঠকরা আমাদের ইমেইল করে জানালে আমরা তাঁকে সাথে সাথে পাঠকদের মতামত জানিয়ে দেব।